WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES X

# শের-ই-বাংলা
# এ.কে. ফজলুল হক

# মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ড. পি. বি. সেলিম
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

# ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস, ডব্লিউ.বি.সি.এস (এক্সিকিউটিভ)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

# শের-ই-বাংলা
# এ.কে. ফজলুল হক

(১৮৭৩-১৯৬২)

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
জানুয়ারী, ২০২৪

## পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)



Printed at Saraswaty Press Limited

# শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

(১৮৯২-১৯৪৭)

আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। বাংলার জনচিত্তে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে তিনি ছাড়া অন্য কেউ সুদূর বা নিকট অতীতে পারেননি। তাই অকুণ্ঠচিত্তে এ কথা বলতে পারা যায় যে, ফজলুল হক অবিভক্ত বাঙলার জনগণের চিত্তে মুকুটহীন রাজার আসন অধিকার করেছিলেন। বাংলার সকল শ্রেণির মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক অখণ্ড বাংলার রাজনীতিতে সমাধিক পরিচিত বাংলা ফজলুল হক নামে; শের-ই-বাংলা বা হক সাহেব বলতেও আপামর জনগণ তাঁকেই জানতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ও জাতির আলোকবর্তিকা; রাজনীতিতে এভাবেই তিনি তাঁর অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন প্রতিটি বাঙালির মননে। বিবিসি বাংলার ২০০৪ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত একটি জরিপে শীর্ষ বিশ জন বাঙালির তালিকায় ৪র্থ স্থানে ছিলেন শের-ই-বাংলা। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতা ছিল সুপরিচিত।

১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর এ. কে. ফজলুক হক অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার রাজাপুর থানার সাতুরিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কাজী মুহম্মদ ওয়াজেদ ও সাইদুন্নেসা খাতুনের একমাত্র সন্তান। বাড়িতেই তাঁর প্রাথমিক

শিক্ষা শুরু হয়। তিনি আরবি, ফার্সি এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮১ সালে তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি ছাত্রবৃত্তি পান। ১৮৮৯ সালে বরিশালের জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি সর্বদা ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ক্লাসে যেমন মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তেমনি খেলার মাঠেও তাঁকে দেখা যেত দক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে। গোল্লাছুট, লাঠিখেলা, কাবাডি, পাঞ্জাকষা প্রভৃতি খেলাধুলায় ছিল তাঁর দুর্দান্ত দাপট। নদী বহুল বাংলার ছেলে সাঁতারেও হয়ে ওঠেন দক্ষ। গ্রামের ছেলেমেয়েদের তিনি ছিলেন সর্দার। ছোটো বেলা থেকে সরদারী মনোভাবের মধ্যেই হয়তো বেড়ে উঠছিলেন ভাবিকালের নেতা। শোনা যায় পাশের বাড়ির বাগান থেকে নারকেল পেড়ে এনে হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়েই নারকেল ফাটিয়ে দু ফাঁক করতেন তিনি। দৈহিক ভাবে ভীষন বলিষ্ঠ এবং দুর্দান্ত পেশী শক্তির অধিকারী যেমন তেমনই ছিলেন অকুতোভয়। শোনা যায়, হক একবার কব্জির লড়াইয়ে এক কাবুলিওয়ালাকে কুপোকাত করেন। কাবুলিওয়ালা বাঙালির এমন কব্জির জোর হতে পারে দেখে হতবাক হয়ে যায়। এর পর তাঁর উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়ার কারণে ফজলুল হক শিক্ষকদের খুবই স্নেহভাজন ছিলেন।

তিনি ১৮৯১ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন শাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়েরও স্নেহভাজন ছিলেন। এই কলেজে পড়ার সময় তাঁর লেখাপড়ার থেকে খেলার দিকে মনোযোগ বেড়ে যায়। টানা কয়েকদিন কলেজে তাঁর অনুপস্থিতি আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর নজরে পড়ে। ফজলুল হকের মত এমন একজন

মেধাবী সম্ভাবনাময় ছেলে লেখা পড়ার জগৎ থেকে হারিয়ে যাবে এই রকম ভাবনায় তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রায় দিন আটেক অপেক্ষার পর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ফজলুল হকের খোঁজ নিতে নিজেই বেরিয়ে পড়েন। ফজলুলের বাসা খুঁজে বের করে তিনি বাসায় তাকে না পেয়ে তার জন্য প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করার পর তার সাক্ষাৎ পান। ফজলুল তো আচার্য্যকে বাসায় দেখে হতবাক এবং ভীত হয়ে পড়েন। ছাত্রকে পড়াশোনায় অবহেলার জন্য সেদিন সতর্ক করলেন তাই নয়, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ফজলুল হকের বাবাকেও ছেলের লেখাপড়ার অবহেলা নিয়ে চিঠি লেখেন। এই সময় দাবার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। এই দাবা প্রতিযোগিতার জন্য তিনি নানা স্থানে দল বেঁধে ছুটতে থাকেন। ফলস্বরূপ তিনি পড়াশুনায় ব্যাপক অমনোযোগী হয়ে পড়েন। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর উদ্যোগে হকের সম্বিৎ ফেরে এবং লেখাপড়ায় গভীর মনোযোগ দেন। এফ.এ. পাশ করার পর ১৮৯৩ সালে তিনি গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাশ করেন। স্নাতোকোত্তর স্তরে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে ফজলুল হক অঙ্কশাস্ত্রে পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৯৭ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এল. পাশ করেন।

১৯১১ সালে এ.কে. ফজলুল হক সমবায় বিভাগের অ্যাসিস্টান্ট রেজিস্ট্রার পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে রেজিস্ট্রারের পদ খালি হলেও ফজলুল হকের যোগ্যতার প্রতি অবিচার করে ব্রিটিশরা রায়বাহাদুর যামিনী কান্ত মিত্রকে সেই পদে বহাল করে। ফজলুল হক এই অন্যায় মেনে নেননি। স্যার সলিমুল্লাহ ফজলুল হককে চাকরি ছেড়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। খানবাহাদুর হাসেম আলী খানকে সঙ্গে করে হক সাহেব

শ্রদ্ধেয় গুরু স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা এলেন। ফজলুল হককে দেখেই স্যার আশুতোষ বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমাকে বারবার বলেছি চাকরি ছাড়তে, তবু তোমার গোলামির মোহ গেল না? ফজলুল হক বললেন, "একসঙ্গেই মাসের শেষে মাইনের টাকাটা পাই....।" জবাব শুনে স্যার আশুতোষ বললেন, "তুমি দেরি না করে হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করো, যতো দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারো, আমি পকেট থেকে তোমাকে মাসে পাঁচশ করে টাকা দেব।" ফজলুল হক চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু সরকার তা গ্রহণ না করে দীর্ঘদিনের ছুটি মঞ্জুর করল এবং ছুটি শেষে তাঁকে ডায়মন্ডহারবারের এসডিও করে হুকুমনামা পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ফজলুল হক এই চাকরি গ্রহণ না করে ১৯১১ সালেই কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করে দিলেন এবং এক বছরের মধ্যেই হাইকোর্টের একজন সেরা উকিল বলে গণ্য হলেন। ফজলুল হককে আর স্যার আশুতোষের অর্থসাহায্য নিতে হয় নি। ওকালতিতে এত দ্রুত উন্নতির নজির খুব কমই পাওয়া যায়। হক সাহেবকে অকুণ্ঠ স্নেহ, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার এবং স্যার সলিমুল্লাহ। এই তিন মহামানবের স্নেহ মমতা, সহচর্য ও আশীর্বাদ লাভ করেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাংলার শার্দূল, অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

১৯১৩ সাল থেকে ফজলুল হক সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের উপনির্বাচনে রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জয়লাভ করেন। ফজলুল হকের অসাধারণ বাগ্মিতা ও আন্তরিকতায় নির্বাচকমণ্ডলী স্বাভাবিকভাবেই

তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর ভাষণে তাঁর বাঙালি সত্ত্বার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে নবাব সলিমুল্লাহর জীবনাবসানের পর বাংলার রাজনীতিতে হক সাহেবের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তিনি মুসলিম লীগের বাংলা শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে তিনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের পক্ষে ছিলেন। দেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকলে দেশের স্বাধীনতার লড়াই আরও সংঘবদ্ধ হবে। তিনি এই উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ফজলুল হক দেশের স্বার্থে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মেলবন্ধন স্থাপন করার চেষ্টা করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটি যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বতন্ত্র নির্বাচন ও আইনসভায় মুসলিমদের আসন সংরক্ষণ দাবি মানা হয়। বাংলার আইনসভায় মুসলমানদের জন্য ৪০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

রাজনীতিতে প্রবেশ করার দু বছরের মধ্যেই গ্রাম বাংলার বিভিন্ন সমস্যা তাকে মর্মাহত করে। তিনি উপলব্ধি করেন জমিদারী, মহাজানি প্রথা উচ্ছেদ না করতে পারলে কৃষক প্রজাদের মুক্তি নেই। বিভিন্ন জেলায় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ার ডাক দেন। প্রথমেই নিজের জেলা বরিশালে ১৯১৫ সালে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দারিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। ১৯২১ সালে গৌর নদীর আগৌল ঝারায় বিশাল কৃষক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাজার হাজার প্রান্তিক কৃষক প্রজা এসে হাজির হয়। হক সাহেব অসাধারণ বাগ্মিতায় সকলের

মন জয় করে নেন। সাম্প্রদায়িক উসকানিতে কান না দেওয়ার পরামর্শ ছাড়া নিত্য জীবনের মূল সমস্যার কথা তুলে ধরেন তার বক্তৃতায়। জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তুলে ধরেন মহাজন-ফড়েদের হাতে পড়ে তাদের কি দুরবস্থা হচ্ছে সেই কথা। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে সভা সমিতিতে ভাষণ দিয়েছেন অক্লান্তভাবে। প্রায় প্রতিদিন মিটিং মিছিল আর জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন এক নাগাড়ে।

পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক অনেক পদে অধিষ্ঠান করেছেন। তার মধ্যে বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯২৪), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭–১৯৪৩) উল্লেখযোগ্য।

১৯১৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও স্বৈরাচারী ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন ভারতের সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে ‘ভারতীয় প্রেস অ্যাক্ট’ নামক একটি কুখ্যাত আইন পাস করে। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনে সাংবাদিক বি জি হর্নিম্যান এই কুখ্যাত আইনটি বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব আনেন। হর্নিম্যান সাহেব ছিলেন বোম্বাই ক্রনিক্যাল পত্রিকার সম্পাদক। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হর্নিম্যান সাহেবের এই প্রস্তাব সমর্থন করে উক্ত অধিবেশনে বজ্রকণ্ঠে একটি গুরুগম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ রেখেছিলেন। তিনি বলেন, “সম্মিলিত ভারতবর্ষের কোটি কোটি কণ্ঠের বজ্র আওয়াজকে রুখতে পারে দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত তেমন কোন শক্তি জন্ম লাভ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নির্যাতন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা মানুষের স্বভাব। আমি আশা করছি ব্রিটিশ শাসকবর্গ সময় থাকতে সাবধান হবেন এবং

অবিলম্বে আইনের পুস্তক থেকে এই দমন মূলক প্রেস অ্যাক্ট অপসারিত করবেন।" ১৯১৮ সালে শেরে-ই-বাংলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। পাশাপাশি শেরে-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে মুসলিম লীগের একাদশতম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "নিজেদের প্রয়োজনেই হিন্দু-মুসলমানদের এক সঙ্গে চলতে হবে।... যেসব মুসলমানেরা অমুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে গর্ব অনুভব করেন এবং ভাবেন ইসলামের প্রতি অনুরক্ত থাকতে হলে এই বিদ্বেষের মনোভাব পোষণ করা দরকার তাদের আচরণ শুধু নীতিগত ভাবে নিন্দনীয় নয় রাজনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিকর। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে এই মনোভাব পোষণ করা হচ্ছে যখন প্রতিটি ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে একটি শক্তিশালী ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রয়োজন।" ফজলুল হক ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে সর্ব ভারতীয় খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৯ সালেই শুরু হয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এই আন্দোলনকে পদদলিত করার জন্য পাস করা হয় কুখ্যাত 'রাওলাট অ্যাক্ট'। ১৯১৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শেরে-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের আরো বহু সংগ্রামী জননেতা। এই বছরই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের তদন্তের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ. কে. ফজলুল হক, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পন্ডিত মতিলাল নেহরু এবং

বদরুদ্দীন তৈয়বজীকে নিয়ে গঠিত হয় একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি। শের-ই-বাংলা ফজলুল হক ছিলেন অন্যায় অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনের অগ্রনায়ক।

শের-ই-বাংলা ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি অত্যাচারী ইংরেজদের বিরোধিতা করে নিপীড়িত বঞ্চিত বাঙালিদের নানা অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের জন্য আজীবন লড়াই করেছিলেন। নিজের জীবনের কখনো পরোয়া করেননি। জীবন বাজি রেখে তিনি দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এক ব্রিটিশ সিভিলিয়ান শেরে-ই-বাংলার কাজের সমালোচনা করলে অসম সাহসী শেরে-ই-বাংলা তাকে বলেছিলেন, "তোমার চরিত্র সংশোধন কর তা নাহলে তোমাকে তল্পিতল্পাসহ এদেশ থেকে বের করে দেবো।" ১৯২১ সালে কলকাতা পুলিশ কমিশনার স্যার রেজিনল্ড ক্লার্কের নির্দেশে নাখোদা মসজিদের সামনে মেশিন গান স্থাপন করা হলে শেরে-ই-বাংলা বলেন, "আমাকে খুন না করে তোমরা অন্য কোন মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারবে না।"

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় সরকারী দপ্তরগুলোর অধিকাংশই ছিল 'রিজার্ভড', আইন সভার বিচার্য বিষয় ছিল না। এর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি ছিল 'ট্রান্সফার্ড' অর্থাৎ সদস্যদের ভোটাভুটির সুযোগ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সুদক্ষ নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে স্বরাজ দল ব্রিটিশ সরকারি দলকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। শের-ই-বাংলা ফজলুল হকের সাথে মত বিনিময় করে দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন দাশ এবং শের-ই- বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক সবচেয়ে বেশি জোর

দেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ওপর। স্যার আব্দুর রহিম, মৌলভী আব্দুল করিম, মৌলভী মুজিবর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত, মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু, মিঃ জে. এম. দাশগুপ্ত ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতার সহযোগিতায় দেশবন্ধু ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট নামক হিন্দু-মুসলিম চুক্তিনামা রচনা করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাজ পরিষদীয় দলের এক সভায় চুক্তিটির শর্তাবলি গৃহীত হয়। এই সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, প্রদেশে সত্যিকারের স্ব-নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চুক্তি কার্যকর হবে। ১৯২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় বেঙ্গল প্যাক্ট পাস হয়। চুক্তির শর্তাদি নিম্নলিখিত ছিল:

ক) বেঙ্গল আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্ব পৃথক ভোটার সহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে হবে।

খ) স্থানীয় সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ৬০ শতাংশ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪০ শতাংশ অনুপাতের ভিত্তিতে হবে।

গ) সরকারী নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ৫৫ শতাংশ নিয়োগ মুসলমানদের দেওয়া উচিত। উপরের শতাংশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ৮০ শতাংশ পদ মুসলমানদের এবং বাকী ২০ শতাংশ পদ হিন্দুদের কাছে যেতে হবে।

ঘ) কোন জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত ৭৫ শতাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতিরেকে কোনও রেজোলিউশন বা আইন প্রয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) মিউজিকসহ মিছিল মসজিদের সামনে করার অনুমতি দেওয়া হবে না। ইত্যাদি

তাঁরা মনে করেছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর গড়ে উঠবে একটি বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ। এবং সেই জাতীয়তাবোধ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করবে না। হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে কি খ্রিষ্টানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত করবে না। স্বরাজ হচ্ছে সেই উপলব্ধি যা মানুষকে মানুষের কাছে টেনে আনবে, মানুষেরই মূল্যে।.... ন্যাশনালিজমের মানে জাতীয়তাবাদ না, মানুষের জাতীয়তাবোধ। ফজলুল হকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান উপাদান ভৌগলিক ও ভাষাগত চেতনাকে শক্তিশালী করে। তিনি সারা ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর দৃষ্টি ছিল বাংলার দিকে। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি সর্বপ্রথম বাঙালি, তারপর আমার অন্য পরিচয়।' তাঁকে বেশ কয়েকবার নাইটহুড দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু 'আমি চাষার পোলা, নাইটহুড কী করব?' বলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মুসলমানের উন্নতির জন্য চেষ্টা করলেও তিনি কোনওদিন সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে তিনি বলতেন, "আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি করি না। সাম্প্রদায়িকতাই বর্তমান ভারতীয় সমাজের গোলযোগের কারণ। সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে জাতীয়তাবাদীর পথ ধরলে মানবসমাজের কল্যাণ হবে ও মুক্তি আসবে।" ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। সে সময় হক সাহেব কলকাতার পার্ক সার্কাসে তাঁর হিন্দু প্রতিবেশীদের রক্ষা করার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেন।

বাংলায় তৎকালীন কংগ্রেসের অনেক প্রতিষ্ঠিত ও বর্ষীয়ান নেতা ‘বেঙ্গল এ্যক্ট’ চুক্তিটির বিরোধিতা করেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা এটির বিপক্ষে অনমনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, চুক্তিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল করে ফেলবে। বাংলা কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্ব বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে বিভাজিত হয়ে গেলেও বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের প্রাণঢালা সমর্থন লাভ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁরা সর্বান্তকরণে চুক্তিটিকে স্বাগত জানান। বাংলার মুসলমানগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, চুক্তিটির বাস্তবায়ন তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার সমস্যার কিছুটা সমাধান করবে ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মূলে আঘাত হানবে। মুসলিম গণমাধ্যমগুলি তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করার মতো ঔদার্য প্রদর্শন করায় বেঙ্গল প্যাক্ট সমর্থনকারী হিন্দুনেতাদের ধন্যবাদ জানায়।

কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ সেশনে চুক্তিটি বাতিল করা হলে তাদের মোহমুক্তি ঘটে। তাদের মতে, কোকনদ কংগ্রেস যে মস্ত ভুল করে সেটি ছিল কংগ্রেস আন্দোলনের ইতিহাসে জঘন্যতম এবং এই ভুল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে এবং কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতি চরম আঘাত হেনেছে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে অবস্থান নিয়েছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ফজলুল হক তার সমালোচনা করে ঘোষণা করেন, “তোমরা সভার সিদ্ধান্তসমূহ থেকে বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেলতে পার, কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে পারবে না...এ রকম শিষ্টাচারহীন রীতিতে বাংলাকে মুছে ফেলা যাবে না। যারা চিৎকার করে বলে যে 'বেঙ্গল প্যাক্টকে মুছে ফেল’ তাদের যুক্তি আমি বুঝতে পারি না... বাংলা কি অস্পৃশ্য? এ রকম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করার বাংলার

অধিকারকে কি তোমরা অস্বীকার করবে? যদি তোমরা তাই কর, বাংলা তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা অভিমত ব্যক্ত করার ব্যাপারে বাংলার অধিকারকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না"।

ভারতীয় কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করলেও চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ফজলুল হক তাঁদের শক্তি ও উদ্দেশ্যের সততার বলে ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে চুক্তিটির বিধানসমূহের অনুমোদন লাভের আপ্রাণ চেষ্টা চালান। মাওলানা মহম্মদ আকরম খাঁ এই অধিবেশনের সভাপতি হন। অধিবেশনে প্রায় পনের হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে চুক্তি অধিবেশনে গৃহিত হয়। সম্মেলনে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন – "হিন্দুরা যদি মুসলমানের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে না পারে, তবে হিন্দু-মুসলিম-ঐক্য আসিবে না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত আমাদের স্বরাজের দাবি চিরকাল কল্পনার বস্তুই থাকিয়া যাইবে।" যদিও ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়েছে, তবু ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন কর্তৃক তিনি চুক্তিটির শর্তাবলি অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হন। দুর্ভাগ্যবশত ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে হিন্দু- মুসলিম ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন অনুসারীও চুক্তিটি বর্জন করেন। অনেক বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক নেতা মর্মাহত হন এবং তাঁরা কংগ্রেস ও স্বরাজ্য উভয় দল থেকেই দূরে সরতে থাকেন। মুসলমানদের দলত্যাগের ফলে প্রদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু মুসলমান নেতা মৌলভী আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুর রউফ, খান বাহাদুর আজিজুল হক, আব্দুল্লা হিল বাকি, মৌলভী আশরাফউদ্দীন, ড. এ সুরাওয়ার্দী এবং অবশ্যই এ কে ফজলুল

হক প্রমুখের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি গড়ে ওঠে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও বাংলার মুসলিমরা পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ ও ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিই মূলত তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করেন।

১৯২৬ সালে অবিভক্ত বাংলার ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমায় কৃষক-প্রজা ও মহাজনদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধে। দেনার দায়ে ওইসব অঞ্চলের কৃষকদের সব জমি জমিদাররা কেড়ে নেয়। মানিকগঞ্জের ঘিওর ঘাটে এক প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার ডাক আসে। ঢাকা সদর, পাবনা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জায়গা থেকে অসংখ্য কৃষক-প্রজা দলে দলে যোগ দেয়। এই বিশাল জনসভায় মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কৃষকদের জমি চাষ করতে নিষেধ করেন শের-ই-বাংলা। তিনি বলেন, দয়া করে যখন জমিদাররা জমি কেড়ে নিয়েছেন তখন কর্তারা এবার মাঠে নেমে চাষ করুন, ফসল বুনুন, ফসল কাটুন, গোলায় ভরুন। কেউ তাদের ডাকে সাড়া দিবেন না। এর জন্য আপনাদের বহু কষ্ট হবে জানি। না খেয়ে মরতেও হবে। পিছিয়ে গেলে চলবে না। জানতে হবে এটাই আমাদের সার্বিক সাফল্যের শেষ হাতিয়ার। তাই বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ নেই। কৃষক-প্রজাগণ আহুত সভায় সম্মিলিত ভাবে সবাই প্রতিজ্ঞা করেন এবার আমরা জমিদার, মহাজনের জমিতে আর ঘাড়ে লাঙ্গল নিয়ে চাষ করতে যাব না। না খেতে পেয়ে মরলেও না। এদিকে জমিদারেরা তাদের সব রকম কূট-কৌশলকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। আন্দোলন প্রায় এক বছর যাবত চলতে থাকে। অনেক কষ্টের সম্মুখীন তারা হতে থাকে। দাঁতে দাঁত

চেপে জমিদারদের অসহ মনোভাব কে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়। সারা বছরে তাদের ও প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হয়। অবশেষে জমিদার ও মহাজনশ্রেণী কৃষকদের জমি ফেরত দিতে বাধ্য হয় ও আপোষ করতে এগিয়ে আসে। এই আন্দোলনের সাফল্যে ফজলুল হকের জীবনে তথা রাজনৈতিক জীবনের পালে হাওয়া লাগে, অসাধারণ বাগ্মিতায় তাই সব রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে ফেলে জনপ্রিয় ব্যাক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

১৯২৭ সালে দেশের সর্ব স্তরের মানুষকে নিয়ে নতুন দল প্রতিষ্ঠা করেন। নাম দেন "নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি"। তিনিই ছিলেন দলের সভাপতি। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব পদে আসীন থেকেও তার সমস্ত শক্তি "কৃষক প্রজা সমিতির" সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে নিয়োজিত করেন। খিলাফত আন্দোলনের শেষে নিজের হাতে গড়া দলকে ভিত্তি করে প্রভাব বৃদ্ধি করতে তৎপর হন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করেও তিনি সবসময় দৃষ্টি দিয়েছেন বাংলার দিকে। তার একমাত্র ধ্যান ধারণা ছিল বাংলার উন্নয়ন। সব সময় ভাবতেন কি করলে বাংলার উন্নতি সম্ভব হবে। কৃষক প্রজা সমিতি দলের মূখ্য উদ্দেশ্য ও দাবি:-

ক) বর্তমান প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের এবং পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে।

খ) বাঙালি হিন্দু- মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের প্রসার ঘটাতে হবে।

গ) ভারতে মুসলমান ও অমুসলমান ঐক্য জোরদার করতে হবে।

ঘ) ভারতীয় মুসলমান ও অন্যান্য দেশের মুসলমান জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে।

ঙ) আইনানুগ ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী জমিদারী প্রথার (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) অবসান ঘটাতে হবে।

১৯৩০-৩১ সালে শের-ই-বাংলা লন্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কংগ্রেস এই বৈঠক বয়কট করে ফলে এই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে।

ফজলুল হক প্রকৃত অর্থেই কৃষক দরদী ছিলেন। খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। বাংলার কৃষকদের দু:খ-দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি আজীবন লড়াই করেছিলেন। ভূমি সংস্কার এবং জমিদারদের প্রভাব রোধে জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, ফজলুল হক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে প্রজাস্বত্বের শিকার লাখ লাখ কৃষকের ঋণ কমাতে আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করেন। কৃষকদের দুর্দশা লাঘবের লক্ষ্যে তিনি মানি ল্যান্ডার্স অ্যাক্ট(১৯৩৮), বেঙ্গল টিন্যান্সি(সংশোধনী) অ্যাক্ট(১৯৩৮) এবং ভূমি সংস্কার আইনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করতে হলে কৃষকদেরও স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত করা প্রয়োজন। তিনিই বাংলার সিংহভাগ কৃষককে রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামে টেনে আনেন। তাঁর নেতৃত্বেই কৃষক সমাজ স্বাধীনচেতা হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। তিনি ইংরেজি রাজত্বের শক্তিশালী স্তম্ভ জমিদার শ্রেণিকে পর্যুদস্ত করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। মাটির কাছাকাছি থেকে প্রান্তিক মানুষের

জন্য রাজনীতি করে গেছেন বরিশালের হক সাহেব। মুসলিম লিগ বা কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন না করে কৃষক প্রজা পার্টির পক্ষে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে তাই তিনি বাজিমাত করতে পেরেছিলেন।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ অনুসারে যুক্তবাংলা সহ তৎকালীন ভারতের ব্রিটিশ অধীনস্ত এগারোটি রাজ্যেই প্রাদেশিক নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৬-৩৭ সালে। ১৯৩৬ সালে মোট তিন কোটি মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালীন ভারতের মোট প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের এক ষষ্ঠাংশ। ভোটাধিকারের ভিত্তি হয়েছিল সম্পত্তির মালিকানা, খাজনা দেওয়ার মত বিষয়গুলি। অর্থাৎ আর্থিকভাবে সক্ষমরাই মূলত ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ রায় এই নির্বাচনে ধরা পড়ে নি। কৃষকেরা এই নির্বাচনে প্রথম ভোটাধিকার পান। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি তার অত্যন্ত আধুনিক ম্যানিফেস্টো নিয়ে লড়াইয়ে নামে। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইস্তেহারে চোদ্দো দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হল। বলা হল, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, মহাজনি আইন প্রণয়ন, সালিশি বোর্ড গঠন, সেচের স্বার্থে হাজা- মজা নদী সংস্কার, প্রতি থানায় হাসপাতাল, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি। ভোট হল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে। ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল, কোনও দল একক ভাবে সরকার গড়ার জায়গায় নেই। মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৪টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়। মুসলিম লিগ ৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি ৪০, মুসলিম স্বতন্ত্র ৪২, হিন্দু স্বতন্ত্র ৩৭, ইউরোপীয় গোষ্ঠী ২৫, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ৪, ইন্ডিয়ান খ্রিস্টান ২, হিন্দু মহাসভা ৩, হিন্দু জাতীয়তাবাদী ২, বাকিটা

অন্যান্য। কংগ্রেস বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সারা ভারতে কংগ্রেসের ফল ছিল বেশ ভালো। ১১৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস জয়ী হয় ৭১৬ আসনে। কংগ্রেস মনোনীত মুসলিম লিগ প্রার্থী জয়ী হন ২৬ জন। মুসলিম লিগের টিকিটে দাঁড়িয়ে জয়ী হন ১০৯ জন। যেটা লক্ষণীয়, সেটা হল, কংগ্রেস এবং কৃষক প্রজা দলের ৯০ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন আন্দোলন করে জেল-ফেরত। ফজলুল হক চেয়েছিলেন কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিলে সরকার গড়তে। সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসের দিকে তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন। কংগ্রেস চাইছিল রাজবন্দিদের মুক্তির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে। কৃষক প্রজা দলের দাবি ছিল অগ্রাধিকার দেওয়া হোক, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, খাতকদের রক্ষার জন্য মহাজনি আইনের প্রণয়ন, কৃষিঋণ মকুব ইত্যাদি কর্মসূচিকে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা ভেস্তে যায়। নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের নির্বাচনের পর ফজলুল হক তাঁর নিজের দল কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম লিগের সমন্বয়ে সরকার গঠন করলেন। তিনিই প্রধানমন্ত্রী (ভারত শাসন আইনে এই পদবিই বিধিবদ্ধ ছিল) বা প্রিমিয়ার হলেন।

এ.কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হবার পর শিক্ষা বিষয়ে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তিনি কলকাতায় 'ইসলামীয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি বর্তমানে 'মৌলানা আজাদ কলেজ' নামে পরিচিত। তাঁর জন্মগ্রাম বরিশালে চাখার কলেজ তৈরি করেন। উল্লেখ্য যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি গণিত শাস্ত্রে অধ্যাপনা করেছেন। এখানে একটি মাদ্রাসা ও একটি হাইস্কুল গড়ে তোলেন। রাজশাহীতে আদিনা ফজলুল হক কলেজ, তাঁরই উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ অন্যতম। ঢাকায় ইডেন কলেজ

প্রতিষ্ঠা করেন। দরিদ্র কৃষকের উপরে কর ধার্য না করে তিনি পুরো বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। কোলকাতায় রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটিকে প্রাদেশিক সরকারের পরিচালনাধীনে এনে বিদ্যালয়টির উন্নতিসাধন করেন। তিনি নারীশিক্ষার উন্নতির জন্য কলকাতার কমলা গার্লস হাই স্কুলকে (প্রতিষ্ঠিত : ১৯৩২) ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৩৬০০ টাকা দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের উন্নতিকল্পে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। পিছিয়ে পড়া মুসলমান মেয়েদের পড়াশোনার জন্য তিনি কলকাতায় ১৯৩৯ সালে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ স্থাপন করেন। পরে এখানে অমুসলিম মেয়েরাও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। মেয়েদের থাকার জন্য তিনি কলেজে একটা 'গার্লস হোস্টেল' তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই হোস্টেল আজও রয়েছে। মেয়েদের পড়ায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভা নটি স্কলারশিপ অনুমোদন করেছিল। ১৯৪০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি একটি ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যা আজ ‘ফজলুল হক মুসলিম হল' নামে পরিচিত।

ফজলুল হক বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহু ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। ১৯৩৯ এর বাংলা দন্তচিকিৎসক আইন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ছাত্রাবাসের প্রযোজনীয়তা অনুভব করে মধ্যে কলকাতার 'বেকার হোস্টেল' এবং 'কারমাইকেল হোস্টেল' প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই ছাত্রাবাসগুলিতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পড়াশোনা করে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এখনো সেই ধারা অব্যাহত। অধুনা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম

নায়ক মুজিবর রহমান এখানেই থেকে পড়াশোনা করেছিলেন। বর্ধমান মহারাজ তেজচাদ বাহাদুরের আমন্ত্রণে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাশেম ফজলুল হক বর্ধমান রাজ কলেজ' এ তারই নামাঙ্কিত ফজলুল হক হোস্টেল অর্থাৎ এফ. এইচ হোস্টেলের শিলান্যাস করেন এবং ফলক উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফজলুল হক রাজা বিজয় চাঁদ এর উদ্দেশে বলেন, "Maharajas mind bigger than his body." ঐ সভায় বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদ সহ সকল শিক্ষাবিদ, সরকারি আধিকারিক, ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমদিকে এফ.এইচ হোস্টেল মুসলিম ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। আর এন আর হোস্টেল বা নলিনী রঞ্জন হোস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের জন্য থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। উভয় ছাত্রাবাসে ৬০ টি করে ছাত্র থাকতে পারত। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে হোস্টেল সর্বসাধারণের জন্য অর্থাৎ সকল শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ শুরু হয়েছে। এখন শুধুমাত্র মুসলিম ছাত্রদের জন্য আর ব্যবহার করা হয় না, সকল শ্রেণির ছাত্রই এই সুযোগ পায়।

ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার নিপীড়িত দরিদ্র কৃষকদের নায্য অধিকারকে মান্যতা দিয়ে তিনি অবিভক্ত বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি গঠন করে বাংলার রাজনীতিতে কৃষকদের অধিকারকে প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তিনি বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৮ সালে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন করে। ১৯৩৮ সালের ১৮ আগস্ট বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী পাস করানো হয় এবং কৃষকদের উপর জমিদারদের লাগামহীন অত্যাচার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়। পাটচাষীদের নায্য মূল্য

পাওয়ার উদ্দেশ্যে 'পাট অধ্যাদেশ' জারি করা হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৩৯ সালে 'চাষী খাতক আইন' এর সংশোধনী এনে ঋণ সালিশি বোর্ডকে শক্তিশালী করা হয়। ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৪০ সালে হক সাহেব আইন পরিষদে 'মহাজনী আইন' পাস করান। এ বছরই 'দোকান কর্মচারী আইন' প্রণয়ন করে তিনি দোকান শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন ছুটি ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের নির্দেশ বলবৎ করেন। পয়লা বৈশাখের প্রথম ছুটিও উনার অবদান। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের সভায় মোট ১৪৮ বার বক্তৃতা করেন। এর মধ্যে ১২৮ বার তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডিপিআই হর্নেল সাহেব ফজলুল হকের শিক্ষাবিষয়ক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে বাংলার 'বেন্থাম' হিসেবে সম্মানিত করেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনেরও প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন শের-ই-বাংলা। শুধু সমর্থন নয়, তিনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা করা কালীন এই মনুমেন্ট ভেঙে ফেলার আদেশ দেন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও শের-ই-বাংলা অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শের-ই-বাংলা ফজলুল হক। ১৯৪১ সালে নেতাজী দেশ ত্যাগ করেন এবং এর পিছনে শেরে-ই-বাংলার পরোক্ষ হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজকে তিনি চূড়ান্তভাবে সমর্থন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদ আলি জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের পক্ষ হতে 'বাংলার বাঘ' ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানান ধরনের মতবিরোধ আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন হক সাহেব লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে একটু দেরি করে বা শেষের দিকে পৌঁছেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আবেগপ্রবণ মানুষ। খসড়া না দেখেই খসড়ার পক্ষে মত প্রণয়ন করেন। একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারা যায়- "প্রশ্ন হল, ফজলুল হক কি এই সাবজেকটস্ কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন? আলোচনার শেষের দিকে এসে পৌঁছুলেও তিনি কি মতামত ব্যক্ত করেছিলেন? এই বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য মুসলিম লীগ কার্যবিবরণীতে পাওয়া যায় না। হয়তো ফজলুল হক এই সাবজেকটস্ কমিটির সভায় শেষ মুহূর্তে এসে মূল প্রস্তাবের দু- একটি শব্দ পরিবর্তন করে তা সামান্য সংশোধন করে প্রস্তাবটিকে চূড়ান্ত রূপ দেবার বিষয়ে সাহায্য করেন। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে লাহোর প্রস্তাবের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করেন। অবশ্য এই বিষয়ে মুসলিম লীগ কার্যবিবরণীতে কোন তথ্য না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে একটি ধারণা করা যায়। মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় অধিবেশনে কোন প্রস্তাব জিন্নার অনুমোদন ছাড়া পেশ করা যেত না। তাছাড়া এই প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করবার কমিটিতে জিন্না ছিলেন এবং তিনি সক্রিয়ভাবে এই খসড়া রচনায় অংশগ্রহণ করেন। জিন্নার পরামর্শ ও অনুমোদন নিয়েই এই প্রস্তাবের চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে বাংলায়,

নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং পাকিস্তান দাবির সমর্থনে এই অঞ্চলের মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে, জিন্না ফজলুল হকের মত একজন প্রভাবশালী বাঙালী নেতার দ্বারা এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। সাদাসিধে ফজলুল হক তখন জিন্নার এই চাতুরি ধরতে পারেননি।" যখন এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলে তখন ফজলুল হক কলকাতা থেকে লাহোর পৌঁছান– "তাই কলকাতা থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করার পর তিনি যে- ভাষণ দেন তার সঙ্গে জিন্নার বক্তৃতার কোনোই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আর- একটি কথাও মনে রাখা দরকার। পাকিস্তান দাবির স্বপক্ষে যাঁরা নানা পরিকল্পনা রচনা করেন তাঁদের মধ্যে সবাই ছিলেন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। কোনো সময়ে তাঁরা কেউ এই নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা ফজলুল হকের সঙ্গে করেননি। অথবা ফজলুল হকও নিজে উদ্যোগী হয়ে কোন স্কিম রচনা করেননি।"

তিনি পাকিস্তান দাবি মানতে পারেননি। ফজলুল হক নিজেই প্রস্তাবের ত্রুটিগুলি লোকসমক্ষে তুলে ধরেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ১৯৩৭ সালে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সময়ে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে জনমত গড়তে সচেষ্ট হয়। ১৯৪২ সালের ২০ জুন এই সংস্থার অধিবেশনে ফজলুল হক দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন। এক দীর্ঘ ভাষণে তিনি বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, "they had got to live together, sink or swim

together and if need be, lay down their lives together for the good of their common motherland" তিনি এই আশা ব্যক্ত করে ভাষণ শেষ করেন যে, “The 20th of June would be a red letter day in the history of Bengal, making a new era of communal peace and harmony.” ফজলুল হক জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এত সরব ছিলেন যে, ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন তুরস্কের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি দল কলকাতায় আসেন, তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তুরস্কের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদলের নেতা এই প্রসঙ্গে বলেন যে, তাঁদের দেশ এই ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। স্বভাবতই লীগের নেতাদের কাছে এই মন্তব্য সুখকর ছিল না, বিশেষত এমন এক সময়ে যখন লীগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মাতৃভূমির দাবী করেছিলেন। ধীরে ধীরে ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাবের ত্রুটিগুলির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই প্রস্তাবের মধ্যে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিটগুলির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি পরিষ্কার নয়। এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা বিষয়েও পরিষ্কার করে কিছুই বলা হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই সূত্র পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে হয়তো সুবিধাজনক কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। এছাড়া যদি বাংলাকে দুই ভাগ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে বাংলাকে বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম ঘিরে রয়েছে। এই অবস্থায় বাংলা পাঞ্জাবের মতো সুবিধা পাবে না। সুতরাং বাংলা মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও, বাংলার সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে একাত্মভাবেই চলতে হবে। পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রয়োজনীয় সংশোধনের উপর গুরুত্ব

দিয়ে তিনি বলেন, "We depend upon the Qaid Azam to modify the Pakistan idea so as to enable the Muslims of Bengal also to assert their self-determination along with the Muslims of other provinces and also members of other communities in all the provinces." এইভাবে ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব হন। ১৯৪২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ফজলুল হকের আচরণের সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। জিন্নাহর পরামর্শ অনুযায়ী বাংলা লিগ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। স্টেটসম্যান কাগজে শায়েদ নামে একজন লেখক প্রতি সপ্তাহে 'দাখেল ইসলাম' নামক প্রবন্ধে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ফজলুল হকের সমালোচনা করতেন। ১৯৪৩ সালের ১ জানুয়ারিও একটি প্রবন্ধে ফজলুল হকের সমালোচনা করা হয়। ফজলুল হক এই অভিযোগের উত্তর দেন। এক ঐতিহাসিক পত্রে তিনি খুব সতর্কতার সাথে পাকিস্তান প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যকে আক্রমণ করে বলেন "১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান গ্রহণের পর থেকেই আমি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি। আমি তখন থেকেই উপলব্ধি করেছিলাম যে, তাত্ত্বিকেরা পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন সময় এমন সব উদ্ভট চিন্তাধারা প্রচার করেছেন যার ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।...আমি অনুভব করেছি পাকিস্তান সম্পর্কে অসত্য ধারণা সৃষ্টি করে বাংলার মুসলমানদের প্রতারিত করা হয়েছে। আমি স্বেচ্ছায় মৌনব্রতী হয়েছি। কারণ আমার মন্তব্য হয়ত ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। ..... সাম্প্রতিককালে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে সে বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই-আমাদের মনে রাখতে হবে, ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলার

সংলগ্ন তিনটি প্রদেশ আছে, যথা আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা। যথাক্রমে আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান জনসংখ্যার আনুপাতিক হার হল ৩৫, ১০, ৪ শতাংশ। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, বাংলার বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিয়ে ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন প্রদেশগুলিসহ স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা সম্ভব নয়। যদি বাংলাকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে হয় তবে তার ফল হবে এই যে, পূর্বাঞ্চল প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হবে, তাকে এমন চারটি প্রদেশ ঘিরে রাখবে যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অতএব বাংলার মুসলমানদের এই বলে ধোঁকা দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না যে, এ ফরমুলা পাঞ্জাব ও বাংলা উভয় অঞ্চলের পর্বে শুভ হবে। বাংলার মুসলমানেরা উপলব্ধি করেছে যে, তাদের স্বার্থ সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত আমরা এই ভেবে জিন্নাহর ওপর নির্ভর করেছিলাম যে, তিনি পাকিস্তান প্রস্তাব এমনভাবে পরিবর্তন করবেন যাতে বাংলার মুসলমানেরা অন্যান্য প্রদেশের মতো মুসলমানের সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করতে পারে।" ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাবের একটানা বিরোধিতা করতে থাকলে মুসলিম লিগপন্থীরা তাঁকে 'গদ্দার' বলতে থাকেন। তবুও তিনি মুসলিমদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'যারা সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ায় তারা ইসলামের শত্রু।' অথচ রাজাগোপালাচারী ও ভুলাভাই দেশাই দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছেন এবং কংগ্রেসকে দিয়ে তাঁরা মানিয়ে নিতেও চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেস হিন্দু সংগঠন আর জিন্নাহই সকল মুসলমানের মুখপাত্র। ফজলুল হক ইসলাম বিরোধী দ্বিজাতি তত্ত্ব মানতেন না। ১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল ফজলুল হক কলকাতায় নেতাজি ভবনে এক ভাষণে বলেন, "বাঙালি এক অখণ্ড জাতি। তাঁহারা একই ভাষায় কথা বলেন এবং একই সুসংহত দেশে বাস করে।

তাঁহাদের আদর্শ এক এবং জীবন ধারণের প্রণালীও এক। বাংলা অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথপ্রদর্শণ করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃবৃন্দের ঊর্ধ্বে থাকিয়া কাজ করিতে পারে। হক সাহেব আরো বলেন, "একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে আমি বিশ্বাস করিনা। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান' এ দুটি বিভেদার্থক শব্দের সাথে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এ সানোর দেশকে দু' ভাগ করেছে তারা বাঙলার ও বাঙালীর দুশমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বুঝায় না। এ শব্দটি বিভ্রান্তি সূচক ও স্বার্থ সিদ্ধির একটা পন্থা মাত্র।"

১৯৪৩ সালে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার জাপানিদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে ধান, চাল, নৌকা এবং যাবতীয় যানবাহন গঙ্গার এপারে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করে। ফজলুল হক দেখলেন 'পোড়ামাটির নীতি' কার্যকর করলে ব্রিটিশদের সুবিধা হলেও না খেতে পেয়ে বাংলার লাখ লাখ মানুষ মারা যাবেন। অতএব সরকারের সর্বনাশা পোড়ামাটি নীতির সঙ্গে শেরে-ই-বাংলা কিছুতেই একমত হতে পারলেন না। ফলে গভর্নর হার্বার্টের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। পরাধীন আইন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও বড়লাটের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মন্ত্রী থাকা যায় না। অতএব পোড়ামাটির নীতি চালিয়ে লাখ লাখ লোকের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করার চেয়ে শেরে-ই-বাংলা মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করা শ্রেয় মনে করলেন। এছাড়াও মেদিনীপুরে পুলিশি নির্যাতনের তদন্ত করতে উদ্যত হলে ইংরেজ গভর্নর হার্বার্টের সাথে তাঁর মতবিরোধ আরো তীব্র আকার ধারণ

করে। অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

ফজলুল হক ছিলেন বাংলার ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কিন্তু বর্তমানে তাঁর নাম ইতিহাসে প্রায় বিস্মৃত। ইংরেজ আমলে বাংলার মানুষকে বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলতে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। সর্বভারতীয় রাজনীতির পাশাপাশি গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাংলা ও বাঙালির সার্বিক উন্নতির জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল তাঁর। দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও চেষ্টা ছিল বাঙালি তথা বাংলার সমাজের দু:খ, কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা দূর করা। বাংলার কৃষক সমাজের সিংহভাগ ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের। আর জমিদাররা ছিলেন বেশিরভাগ বর্ণহিন্দুরা। তিনি সর্বোতভাবে সচেষ্ট ছিলেন বাংলার চাষীদের মুখে ভাষা ফোটাতে। বাংলার মানুষের মনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত রচনা করেছিলেন তিনি। বাংলায় স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনেছেন। ফজলুল হকের সাফল্য এবং ব্যর্থতা এখানেই যে তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির প্রথম পরিচয় হিন্দু বা মুসলমান নয়, বাঙালিই তার প্রথম পরিচয়। তাঁর মন্ত্রিসভায় হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি ছিল। তিনি ভারতবর্ষের মূলশক্তি বহুত্ববাদকে প্রাধান্য দিতেন। তাই কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা শ্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতা ছিল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী, প্রসন্ন দেব রায়কুট, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব মোশাররফ হোসেন এবং সৈয়দ নওশের আলী তাঁর মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। মুসলিম লিগের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ভয়ংকর অশান্ত সময়ে এই রাজনীতির চর্চা করেছিলেন। কিছুটা এগিয়েও ছিলেন। হেরেও গিয়েছিলেন অবশেষে। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলে গিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

শেরে বাংলা স্মরণিকা ২০২৩, ডঃ রামিজ রাজা ও শেখ আবদুল মুরাদ

Helpline

**1800 120 2130**

Whatsapp Chatbot

**8017444111**

Visit Us at

**http://www.wbmdfc.org/**


**WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION**

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064